NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY

STUDY MATERIAL

ESO

PAPER - IV

MODULES : 3

ELECTIVE SOCIOLOGY HONOURS

প্রাক্কথন

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক শ্রেণির জন্য যে-পাঠক্রম প্রবর্তিত হয়েছে, তার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল প্রতিটি শিক্ষার্থীকে তাঁর পছন্দমতো কোনও বিষয়ে সাম্মানিক (honours) স্তরে শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া। এ-ক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের গ্রহণ ক্ষমতা আগে থেকেই অনুমান করে না নিয়ে নিয়ত মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে সেটা স্থির করাই যুক্তিযুক্ত। সেই অনুযায়ী একাধিক বিষয়ে সাম্মানিক মানের পাঠ-উপকরণ রচিত হয়েছে ও হচ্ছে—যার মূল কাঠামো স্থিরীকৃত হয়েছে একটি সুচিন্তিত পাঠক্রমের ভিত্তিতে। ইন্দিরা গান্ধী মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ও রবীন্দ্র মুক্ত বিদ্যালয়ের কেন্দ্র ও রাজ্যের অগ্রগণ্য বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পাঠক্রম অনুসরণ করে তার আদর্শ উপকরণগুলির সমন্বয়ে রচিত হয়েছে এই পাঠক্রম। সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অধ্যেতব্য বিষয়ে নতুন তথ্য, মনন ও বিশ্লেষণের সমাবেশ।

দূর-সঞ্চারী শিক্ষাদানের স্বীকৃত পদ্ধতি অনুসরণ করেই এইসব পাঠ-উপকরণ লেখার কাজ চলছে। বিভিন্ন বিষয়ের অভিজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর সাহায্য এ-কাজে অপরিহার্য এবং যাঁদের নিরলস পরিশ্রমে লেখা, সম্পাদনা তথা বিন্যাসকর্ম সুসম্পন্ন হচ্ছে তাঁরা সকলেই ধন্যবাদের পাত্র। আসলে, এঁরা সকলেই অলক্ষ্যে থেকে দূর-সঞ্চারী শিক্ষাদানের কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছেন; যখনই কোনও শিক্ষার্থীও এই পাঠ্যবস্তুনিচয়ের সাহায্য নেবেন, তখনই তিনি কার্যত একাধিক শিক্ষকমণ্ডলীর পরোক্ষ অধ্যাপনার তাবৎ সুবিধা পেয়ে যাচ্ছেন।

এইসব পাঠ উপকরণের চর্চা ও অনুশীলনে যতটা মনোনিবেশ করবেন কোনো শিক্ষার্থী, বিষয়ের গভীরে যাওয়া তাঁর পক্ষে ততই সহজ হবে। বিষয়বস্তু যাতে নিজের চেষ্টায় অধিগত হয়, পাঠ-উপকরণের ভাষা ও উপস্থাপনা তার উপযোগী করার দিকে সর্বস্তরে নজর রাখা হয়েছে। এর পর যেখানে যতটুকু অস্পষ্টতা দেখা দেবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পাঠকেন্দ্রে নিযুক্ত শিক্ষা-সহায়কগণের পরামর্শে তার নিরসন অবশ্যই হ'তে পারবে। তার ওপর প্রতি পর্যায়ের শেষে প্রদত্ত অনুশীলনী ও অতিরিক্ত জ্ঞান অর্জনের জন্য গ্রন্থ-নির্দেশ শিক্ষার্থীর গ্রহণ ক্ষমতা ও চিন্তাশীলতা বৃদ্ধির সহায়ক হবে।

এই অভিনব আয়োজনের বেশ কিছু প্রয়াসই এখনও পরীক্ষামূলক—অনেক ক্ষেত্রে একেবারে প্রথম পদক্ষেপ। স্বভাবতই ত্রুটি-বিচ্যুতি কিছু কিছু থাকতে পারে, যা অবশ্যই সংশোধন ও পরিমার্জনার অপেক্ষা রাখে। সাধারণভাবে আশা করা যায়, ব্যাপকতর ব্যবহারের মধ্য দিয়ে পাঠ-উপকরণগুলি সর্বত্র সমাদৃত হবে।

অধ্যাপক (ড.) শুভ শঙ্কর সরকার
উপাচার্য

প্রথম সংস্করণ : ফেব্রুয়ারি, 2022

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের দূরশিক্ষা ব্যুরোর বিধি অনুযায়ী মুদ্রিত।
Printed in accordance with the regulations of the Distance Education
Bureau of the University Grants Commission.

পরিচিতি

Subject : Sociological Theory সাম্মানিক স্তর

পাঠক্রম : পর্যায়

ESO - IV Module : 3

Phenomenology & Enthnomethodology

: Board of Studies :

Members

Professor Chandan Basu
Director, School of Social Sciences
Netaji Subhas Open University (NSOU)

Professor Bholanath Bandyopadhyay
Former Professor
Department of Sociology, University of Calcutta.

Professor Sudeshna Basu Mukherjee
Department of Sociology
University of Calcutta.

Kumkum Sarkar
Associate Professor
Department of Sociology, NSOU

Srabanti Choudhuri
Assistant Professor
Department of Sociology, NSOU

Professor Prashanta Ray
Emeritus Professor
Presidency University

Professor SAH Moinuddin
Department of Sociology
Vidyasagar University

Ajit Kumar Mondal
Associate Professor
Department of Sociology,
NSOU

Anupam Roy
Assistant Professor
Department of Sociology, NSOU

: *Course Writer* :

Unit 1-4 : Dr. Sudarshana Sen
Department of Sociology,
Gour Banga University

: *Course Editor* :

Dr. Srabaniti Choudhury
Assistant Professor of Sociology,
NSOU

: *Format Editing* :

Srabanti Choudhuri
Assistant Professor of Sociology, NSOU

প্রজ্ঞাপন

এই পাঠ-সংকলনের সমুদয় স্বত্ব নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা সংরক্ষিত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ছাড়া এর কোনো অংশের পুনর্মুদ্রণ বা কোনোভাবে উদ্ধৃতি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

কিশোর সেনগুপ্ত
নিবন্ধক

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

বিষয় : Sociological Theory

Phenomenology & Enthnomethodology, Module : 3

Unit - 1 ❐ Phenomenology : Basic Arguments **11-14**

Unit - 2 ❐ Ethnomethodology : Basic Arguments **15-21**

Unit - 3 ❐ Contributions of Schutz **22-25**

Unit - 4 ❐ Contributions of Garfinkel **26-30**

মডিউলের উদ্দেশ্য Purpose of the Module

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রায় শেষ দিকে বৃহৎ বিশ্লেষত্মক পদ্ধতিতে ব্যাখ্যার পরিবর্তে ক্রমশ ক্ষুদ্রতর ক্ষেত্রে ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির এবং ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক সম্বন্ধে বেশি উৎসাহ দেখা যায়। নিখীল কাঠামোর পরিবর্তে, যেমন, বিবর্তন, শ্রেণি সংগ্রাম থেকে ধীরে ধীরে তাত্ত্বিকদের দৃষ্টি সরে আসতে শুরু করে। ফলে সামাজিক মিথষ্ক্রিয়া ও তার প্রভাবে ব্যক্তি ও ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক সম্বন্ধে ভাবনায় বদল আসে। এই পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে এই মডিউলে আলোচনা করা হবে যে অনু ক্ষেত্রের বিশ্লেষণ সমাজতত্ত্বকে কীভাবে এগিয়ে নিয়ে যায় নতুন এক ভাবনার দিকে।

ভূমিকা Introduction

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে মার্কস, দুর্খ্যাইম, স্পেন্সর ও অন্যান্য ইউরোপীয় দার্শনিক ও সমাজতত্ত্ববিদ্‌দের আলোচনায় নিখীল প্রেক্ষিতের ওপর যেভাবে জোর দেওয়া হত তা ধীরে ধীরে পরিবর্তন হতে শুরু করে। সামাজিক বিবর্তন, সামাজিক পরিবর্তন, সমাজ কাঠামো ইত্যাদি নিখীল বিষয় থেকে অণু ক্ষেত্রের আলোচনা যেমন সামাজিক মিথস্ক্রিয়ার প্রকৃতি ও কার্যপ্রক্রিয়া, সামাজিক মিথস্ক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়ে ওঠে।

আধুনিক মিথস্ক্রিয়াবাদীরা ইউরোপ ও আমেরিকার উজ্জ্বল চিন্তাবিদ্‌দের থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে ১৮৮০ থেকে ১৯৩৫-র মধ্যে মিথস্ক্রিয়া ও ব্যক্তি এবং সমাজের সম্পর্কে ব্যক্তির নিযুক্তি (agency) কে প্রাধান্য দিতে শুরু করেন। আধুনিক সামাজিক মিথস্ক্রিয়াবাদীদের মধ্যে অবশ্যই জর্জ হার্বার্ট মীডের নাম উল্লেখযোগ্য যিনি আধুনিক মিথস্ক্রিয়াবাদের মৌলিকতা প্রতিষ্ঠায় তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন। কিন্তু মীডের বক্তব্যে আমরা সন্তোষজনকভাবে এই সমস্যাটির উত্তর পাই না যে সমাজের কাঠামো কীভাবে ব্যক্তির ব্যবহারের প্রকৃতি গঠন করে এবং তদ্বিপরীত। এই অস্পষ্টতা দূর করতে সমাজতত্ত্বে ভূমিকা সম্বন্ধীয় তত্ত্ব (Role Theory) গড়ে ওঠে। সেক্ষেত্রে রবার্ট পার্ক, মরেনো প্রমুখ উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। এর সমসাময়িকভাবে ইউরোপে জর্জ সিমেল-এর 'সোসিয়েশন' (Sociation)-র বক্তব্য যে সহযোগীতা বা দ্বন্দ্ব দুই-ই সামাজিক মিথস্ক্রিয়ার প্রেক্ষিতেই গড়ে ওঠে তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এছাড়া ম্যাক্স ওয়েবর তার সমাজতত্ত্বে নিখীল কাঠামোর পাশাপাশি ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সামাজিক সম্পর্ক সম্বন্ধে তার সচেতনতা সম্বন্ধে ও উৎসাহী হন। ফলে এই প্রেক্ষিতে প্রপঞ্চবাদ ও পরবর্তীতে এথনোমেথোডোলজি সামাজিক মিথস্ক্রিয়া সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনায় উৎসাহী তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি হিসাবে গড়ে ওঠে।

Unit 1 ❐ Phenomenology : Basic Arguments

গঠন

1.1 প্রপঞ্চবাদ কি? (What is Phenomenology)

1.2 হুসারেলের প্রপঞ্চবাদ (Husserl's Phenomenology)

1.1 প্রপঞ্চবাদ কি? (What is Phenomenology)

'ফেনোমেনোলজি' শব্দটি (প্রপঞ্চবাদ) প্রথম ব্যবহার করেন এডমন্ড হুসারেল। তার রচিত গ্রন্থটির নাম 'আইডিয়াজ ইন্ট্রোডাক্শন্ টু পিয়োর ফেনোমেনোলজি' (১৯১৩)। এই বহুপর্যায়ী, বাস্তবকে বোঝা ও ব্যাখ্যা করার প্রয়াস মানুষ স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছে। তার কারণ মানুষ সব সময়ই চেয়েছে যে সে যে বিশ্বকে দেখছে তার উৎস, উৎপত্তি, সম্পর্ক ও ব্যাখ্যা না করতে পারলে সে এই বিশ্বকে সঠিকভাবে বুঝতে পারবে না। এমন ভাবনা থেকেই তাঁর এই প্রচেষ্টা। শুধুমাত্র তার চারপাশের পরিস্থিতিকে বোঝা বা অনুধাবনের চেষ্টাই নয় মানুষ এই বিশ্বের সঙ্গে তার সম্পর্কের উৎস অনুসন্ধান করতেও উৎসাহী। সমাজতত্ত্বে সনাতনী দৃষ্টিভগি থেকে এই বিষয়ে ব্যাখ্যা সামাজিক ব্যবহারের ঐতিহাসিক ও কার্যনির্বাহী চরিত্র অনুধাবনে সীমিত ছিল। প্রপঞ্চবাদী ব্যাখ্যা সামাজিক জীবনকে সামাজিক জীব অর্থাৎ ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গির থেকে সামাজিক ক্রিয়ার প্রতিফলন হিসাবে অনুধাবনে উৎসাহী হয়। মানুষের চারপাশে যা ঘটছে তা কি প্রকৃতির ও তার প্রকৃত অর্থ কি এই প্রশ্নের ক্ষেত্রে প্রপঞ্চবাদী দৃষ্টিভগি তিনটি বিষয়ের ওপর জোর দেয়। প্রথমত, সামাজিক বিশ্বে ব্যক্তি কিভাবে অর্থদান করে। সেক্ষেত্রে এই ব্যাখ্যায় অন্যান্য ব্যক্তি, তাদের ক্রিয়া যে কোনো সামাজিকর ঘটনা, বস্তু ইত্যাদিও অন্তর্ভুক্ত হয়। দ্বিতীয়ত, কি বা কোন্ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ব্যক্তি নিজেকে ও অন্যদের দেখে? তৃতীয়ত, তাদের অন্যের প্রতি ব্যবহারে কি কি প্রেরণা কার্যকর হয় তা দেখা।

প্রপঞ্চবাদী সমাজতত্ত্বের ভিত্তিও এক বিশেষ দর্শন। বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় ভাগে এই দৃষ্টিভগি বিশেষ আলোড়ন ফেলে। প্রপঞ্চবাদী দৃষ্টিভঙ্গি প্রত্যক্ষবাদী চিন্তার একটি সমালোচনামুখী অবস্থান যেখানে ব্যক্তিকে সচেতন, সক্রিয়, ক্রিড়ক হিসাবে গণ্য করা হয়।

প্রপঞ্চবাদী চিন্তা হুসারেলের দর্শন ও ম্যান্‌হাইমের সমাজতত্ত্ব থেকে উৎসারিত হয়। প্রপঞ্চবাদী চিন্তা আন্ত:বিষয়ক চেতনার (intersubjective consciousness) প্রকৃতি কি তার ওপর বিশেষ জোর দেয়। অর্থাৎ দৈনন্দিনের প্রাত্যহিকতায় ব্যক্তির নিজস্ব, ব্যক্তিগত ভাবনা ও বোধ কিভাবে তার চারপাশের অন্যান্য ব্যক্তি, বস্তু, ঘটনা ইত্যাদিকে ব্যাখ্যা করে থাকে সে বিষয়ক চেতনার প্রকৃতির অনুসন্ধান ও অনুধাবনই প্রপঞ্চবাদ। কার্ল ম্যানহাইম ১৯৪৯ সালে 'ইডিওলজি এন্ড ইউটোপিয়া' গ্রন্থে আলোচনা করেন যে ব্যক্তির জ্ঞান তার সামাজিক-সাংস্কৃতিক অবস্থানের ফসল। অর্থাৎ জ্ঞান হলো কোনো ব্যক্তির সামাজিক অবস্থান

বিশেষত তার সামাজিক শ্রেণিগত অবস্থানের একটি ফল। যদিও ম্যানহাইম বৌদ্ধিক জ্ঞানের সামাজিক-ঐতিহাসিক জালের প্রকৃতি ইত্যাদির ওপর জোর দিয়েছিলেন, প্রপঞ্চবাদী দর্শন সামাজিক ক্ষেত্রের আত্মবাদী, ব্যক্তিগত, দিকের ওপরই জোর দেয়।

বার্জার ও লাক্‌ম্যান (১৯৬৬) দেখিয়েছেন যে এই বিশ্ব সামাজিক ভাবে গঠিত। অর্থাৎ ব্যক্তিই তার আত্মবাদীতার সাহায্যে তার চারপাশকে ব্যাখ্যার মাধ্যমে সামাজিক বিশ্বের ধারণা ও তাকে অনুধাবনের সূত্র গড়ে তোলে। এই বিশ্বের যেমন নৈর্ব্যক্তিক অস্তিত্ব আছে তেমনি এই বিশ্ব আন্তঃআত্মবাদী চেতনার মাধ্যমে ব্যক্তির কাছে প্রতিপন্ন হয়। অর্থাৎ এই বিশ্ব ব্যক্তির অস্তিত্বের বাইরে অবস্থিত আবার একই সঙ্গে এটি মানব চেতনার ও ক্রিয়ার একটি ফসল। অর্থাৎ ব্যক্তি এই বাস্তবের নৈর্ব্যক্তিক অস্তিত্ব সম্বন্ধে যেমন ওয়াকিবহাল তেমনি তিনি নিজেও সমাজের বাস্তবতার নিরীখে একজন 'সামাজিক' ব্যক্তিও। অর্থাৎ এই বাস্তব অর্থদানকারী ব্যক্তিদের বিভিন্ন ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার আন্তঃজালের মাধ্যমে সৃষ্ট। বার্জার ও লাক্‌ম্যান দেখিয়েছেন যে দৈনন্দিন জীবন এমন এক বাস্তবকে উপস্থিত করে যা ব্যক্তির কাছে আত্মবাদী ও অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে। সুতরাং সমাজ অর্থদানকারী ব্যক্তির ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ারই প্রকাশ। বার্জার ও লাক্‌ম্যান তাদের গ্রন্থে আলোচনা করেছেন যে এই বিশ্ব শুধুমাত্র যে সামাজিকভাবে গঠিত তাই নয়, এই বিশ্ব সামাজিকভাবে বজায়ও থাকে। অর্থাৎ এই বাস্তব নৈর্ব্যক্তিকতা ও আত্মবাদীতার ধারাবাহিকতায় সমৃদ্ধ। এই বাস্তব নৈর্ব্যক্তিক কারণ এটি সাধারণ, 'ধরে নেওয়া হয় এমন বা প্রাক্ অবহিতিপূর্ণ (taken for granted) ঘটনার প্রযোজনা (factity)-র দ্বারা গঠিত। এই বাস্তব আত্মবাদী কারণ এই বাস্তবতার প্রযোজনা (factity) ব্যক্তির সচেতনতার ওপর ছাপ ফেলে। এই বাস্তবের নৈর্ব্যক্তিকতা ও আত্মবাদীতা সামাজিক প্রক্রিয়া গঠন, পুনর্গঠন ও তাকে বজায় রাখে। ব্যক্তির দৈনন্দিন কার্যকলাপে এই বাস্তবের অধ্যয়নই প্রপঞ্চবাদ।

প্রপঞ্চবাদের মূখ্য লক্ষ্য হলে সব ঘটনাকে (phenomenon) তার মৌলিক ও ভিত্তিগত উপাদানগুলির নিরীখে বিচার করা। হুসারেল মনে করেন প্রপঞ্চবাদের উদ্দেশ্যই হলো মানুষের সচেতনতা ও অভিপ্রেত যা তা (intentionality)-র নিরীখে সব ঘটনাকে বিচার করা। সামাজিক প্রপঞ্চবাদ প্রথমতঃ মনে করে যে প্রায় সব ধরনের মানব অভিজ্ঞতাই 'সামাজিক' ও 'সাংস্কৃতিক'। সামাজিক প্রপঞ্চবাদীরা মনে করেন অপৃথকীকৃত অভিজ্ঞতা সামাজিকভাবে উৎপাদিত প্রতিনিধিত্বকারী (typified) ক্রিয়া যা মানুষ ও বস্তুর প্রেক্ষিতে অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে। অর্থাৎ, মানুষের জীবনচর্চা ও যাপনের প্রেক্ষিতেই অভিজ্ঞতার মধ্যে বিভেদ না করে বরং সংবদ্ধভাবে একটি সামাজিকভাবে উৎপাদিত ও প্রতিনিধিত্বকর ঘটনা হিসাবে দেখা যেতে পারে। এই জগত বোধগম্য এবং ভবিষ্যৎদর্শী হয়ে ওঠে মানুষের অর্থপূর্ণ অর্থদানের মাধ্যমে। সাধারণভাবে সমাজতত্ত্বে যেভাবে পর্যবেক্ষণগ্রাহ্য অবস্থার কিছু বহিরাগত উপাদানকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়, প্রপঞ্চবাদ সেদিক থেকে ভিন্নতর অবস্থান গ্রহণ করে। দৈনন্দিন জীবনের প্রথম পক্ষের প্রতিনিধিত্বকারী (typification)-এর যৌক্তিকতাকে অতিক্রম করে দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রতিনিধিত্বকারীর ব্যাখ্যা গ্রহণ করে।

1.2 হুসারেলের প্রপঞ্চবাদ (Husserl's Phenomenology)

হুসারেল দেখিয়েছেন যে সমাজতত্ত্বে সাধারণভাবে গৃহীত পদ্ধতি হল প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের পদ্ধতি যা সর্বসম্মতভাবে গৃহীত সত্যের উপলব্ধির ওপর ভিত্তি করে অচেনা, অপ্রত্যাশিত ঘটনার বিশ্লেষণে ব্যবহার

হয়। হুসারেল দেখান যে প্রপঞ্চবাদী দৃষ্টিভঙ্গি এই সনাতনী পদ্ধতি ও দৃষ্টিভঙ্গির থেকে আলাদা। সামাজিক কাঠামো ও সামাজিক সম্পর্কের অধ্যয়নে প্রপঞ্চবাদ পর্যবেক্ষণ ও বর্ণনার সাহায্যে সমস্ত ধরনের প্রাক্-ধারণা ও প্রকল্পকে চাপা দিয়ে সামাজিক বিশ্বের বিশ্লেষণ করে। অর্থাৎ যখন কোনো প্রপঞ্চবাদী কোনো সামাজিক অনুসন্ধান চালান তিনি যে কোনো ধরনের প্রাক্ বিশ্লেষণকে সরিয়ে রেখে সামাজিক বাস্তবের ব্যাখ্যা দিতে উদ্যোগী হন। কিন্তু হুসারেল মনে করেন কোনো গবেষণা চালানোর সময় প্রাক্-বিশ্লেষণকে সরিয়ে রাখার চেষ্টা করলেও যে কোনো ধরনের ধারণা, বিশ্বাসকে সম্পূর্ণরূপে সরিয়ে রাখা সম্ভব হয় না। প্লেটোর মত তিনিও বিশ্বাস করেন যে সব ধরনের বিজ্ঞনই কোনো না কোনো ধরনের প্রাক্-ধারণা বা প্রাক্-বিশ্লেষণে সমৃদ্ধ থাকে যা থেকে সম্পূর্ণভাবে সেই বিজ্ঞন মুক্ত হতে পারে না। ফলে সামাজিক ব্যবহার সামাজিক অভিজ্ঞতার অংশ হয়ে ওঠে। অর্থাৎ সামাজিক অভিজ্ঞতার মধ্যে দুটি দিক। এক, সামগ্রিক সামাজিক অভিজ্ঞতার অংশ হিসাবে অভিজ্ঞতা ও দুই যা অভিজ্ঞাত হচ্ছে (experience and experienced)। হুসারেল মনে করেন সামাজিক বিশ্বকে বিশ্লেষণে এক নৈর্ব্যক্তিক, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বহির্ভূত বিশ্বের অস্তিত্বকে অস্বীকার করে ব্যক্তির বিশ্বাসের ওপর ভরসা করেই প্রপঞ্চবাদী দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা দরকার। অর্থাৎ বিশ্ব সম্বন্ধে প্রাক্-ধারণার 'স্বাভাবিক প্রবণতা' (nature attitude) থেকে বিরত থেকে এক বিশেষ পদ্ধতিবিদ্যার প্রচলন দরকার। এই বিরত থাকার প্রচেষ্টাকে হুসারেল 'epoche' আখ্যা দেন। এর অর্থ 'বিচারের বিলম্বন' ('suspension of judgment')। এর অর্থ এই যে মানব বিশ্বের বাস্তবতার ওপর আমাদের বিশ্বাসকে মুহূর্তের জন্য বিলম্বিত (suspend) করে শুধুমাত্র আমাদের অনুসন্ধানী দৃষ্টিকে বিশ্ব সম্বন্ধে সচেতনতার দিকে নির্দিষ্ট করতে হবে। হুসারেল মনে করতেন এর মাধ্যমে আমরা 'ব্র্যাকেটিং' (bracketing) করতে পারি, অর্থাৎ বস্তু জগৎ সম্বন্ধে আমাদের সব ধরনের অভিজ্ঞতা ও প্রতিবর্তকতাকে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে ফেলা। অর্থাৎ আমাদের জীবন-বিশ্বকে যে সমস্ত সাংস্কৃতিক উপাদানের সাহায্যে আমরা চিহ্নিত করি, সংগঠিত করি বা বুঝি সেই সব উপাদানগুলির সচেতনতা থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখার চেষ্টা করা। প্রপঞ্চবাদ, এই অর্থে, তাৎক্ষণিক অভিজ্ঞতাকেই গুরুত্ব দেয়। হুসারেল কেন সব ধরনের সাংস্কৃতিক উপাদানকে দূরে ঠেলে বা সরিয়ে রাখতে বলেছেন তার কারণ হলো তিনি মনে করতেন যে বাস্তবতা, সত্যতা শুধুমাত্র শুদ্ধ সচেতনতাতেই পাওয়া সম্ভব। যারা বা যে সব সামাজিক চিন্তাবিদ্‌রা বাস্তবতা, অর্থদান প্রক্রিয়া, সামাজিক স্থিতাবস্থাকে মানুষের অস্তিত্বের বাইরের অবস্থান বলে মনে করেন তাদের বিপক্ষে হুসারেলের এই মন্তব্য ও বিশ্বাস যে মানুষের যে কোনো অস্তিত্বের শিকার কিন্তু ব্যক্তির চেতনায় অবস্থিত। সামাজিকীকরণ ও সাংস্কৃতিক ছোঁয়ার বাইরে যে অভিজ্ঞতা সেই সচেতন অভিজ্ঞতাই দেখার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা দরকার। তিনি এই কারণে শুদ্ধ সচেতনতার মৌলিক কাঠামোর অনুসন্ধান করেছেন। তার মতে, গবেষক যখন বিশ্ব সম্বন্ধিত বাস্তবতার বিশ্বাসকে বিলম্বিত করে এবং সক্রিয় ও সোজাসুজিভাবে তার চেতনার মধ্যে দিয়ে অভিজ্ঞতাকে দেখেন সেই প্রচেষ্টাই 'epoche'। তিনি মনে করেন গবেষণায় কোনো সাংস্কৃতিক বোঝা বয়ে বেড়ানোর প্রয়োজন নেই। গবেষকের কাছে তিনি দাবি রাখেন যেন তারা সাংস্কৃতিক উপাদানের অগ্রাহ্য করে কোনো সামাজিক বিষয়কে দেখবেন।

পরবর্তীকালে হুসারেলের দৃষ্টিভঙ্গি দুটি ক্ষেত্রে ভীষণ প্রয়োজনীয় তাত্ত্বিক সংযোজন হিসাবে দেখা হয়ে থাকে। এক, হুসারেল দেখান জীবন-জগৎ (life world) হলে প্রাক্ অবহিতি (tanen-for-granted)। এটি

নিয়ে ভাববার অবকাশ কম থাকলেও এর কাঠামো মানুষ কীভাবে কাজ করবেন ও চিন্তা করবেন, তার ওপর বিশেষ প্রভাব ফেলে। দুই, মানুষ কিছু অমুমানের (Presumption) ওপরে ভিত্তি করে অভিজ্ঞতা লাভ করে। এই জগতে থেকে মানুষ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে, তাদের এক এক ধরনের সচেতনতা থেকে অভিজ্ঞতা লাভ করে। কিন্তু তাদের কাছে এমন কোন ক্ষমতা নেই যা দিয়ে তারা বুঝতে পারে যে তাদের অনুমান সঠিক। অথচ, মানুষ এমনভাবে কাজ করে চলে যেন মনে হয় তারা একই জগতের থেকে অভিজ্ঞতা প্রাপ্ত হচ্ছেন। অর্থাৎ হুসারেল দেখালেন যে মানুষের কাজকর্ম এই প্রাক্-অবহিতি (taken-for-granted) জীবজগতে এক যোগে সম্মিলিতভাবে অভিজ্ঞতাপ্রাপ্ত হচ্ছে এমনই অনুমান (Presume) করা হয়। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই হুসারেল প্রাকৃতিক বিজ্ঞনের সমালোচনা করেন। তিনি বলেন সামাজিক ঘটনাকে বুঝতে সচেতনতার প্রয়োজন। এই সচেতনতার বিষয়ীগত বিষয় (Substantive) ও বিষয়বস্তু (Content) এই জীবনজগৎ। সুতরাং জীবনজগৎ নয় বরং সচেতনতার প্রক্রিয়াসমূহও গুরুত্বপূর্ণ। হুসারেলের মূল লক্ষ্য ছিল এমন একটি মূর্ত তত্ত্ব গঠনের যা বাহ্যিক সামাজিক জগৎ থেকে (মানুষের চেতনার বাইরে) 'ব্র্যাকেটেড' (bracketed) ও 'বিলম্বিত' (suspended) থাকবে।

Unit 2 ❐ Ethnomethodology : Basic Arguments

গঠন

2.1. ভূমিকা

2.2. মূলধারা সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি ও এথনোমেথোডোলজি (Mainstreem perspective and Ethnomethology)

2.3. প্রতীকী মিথষ্ক্রিয়াবাদ ও এথনোমেথোডোলজি (Symbolic Interactionism and Ethnomethology)

2.4. বিভিন্ন ধরনের এথনোমেথোডোলজি (Various forms of Ethnomethology)

2.5. মূলধারার সমাজতত্ত্বের সমালোচনা (Criticisms of Mainstream Sociology)

2.6. এথনোমেথোডলজির মূল নীতিসমূহ (Main Principles of Ethnomethodology)

2.7. এথনোমেথোডলজির সমালোচনা (Criticisus against Ethnomethodology)

2.8. এথনোমেথোডলজি ও অনু-নিখীল ব্যবস্থা (Ethnomethodology and Micro-Macro Order)

2.9. এথনোমেথোডলজি কি একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি, একটি পদ্ধতিবিদ্যামাত্র নাকি একটি নতুন সংযোজন? (Is Ethnomethodology a new perspective only a methodology or a new addition)

2.1. ভূমিকা

'এথনোমেথোডোলজি' তত্ত্বটির সূত্রপাত হয় ১৯৪৫ সালে হ্যারল্ড গারফিঙ্কেলের লেখায়। 'এথনো' ('ethno') শব্দটির অর্থ কোনো গোষ্ঠীর সদস্যরা বা সাধারণ মানুষ। এই সূত্র ধরে 'এথনোমেথোডোলজি' শব্দটির অর্থ হলো সাধারণ মানুষ তাদের দৈনন্দিন জীবনে কিভাবে বা কি পদ্ধতিতে তাদের সামাজিক জগৎ সম্বন্ধে জ্ঞাত হন। মনে রাখা জরুরী যে আমাদের এই দৈনন্দিন (every day) সম্বন্ধে নিজেদের 'taken for grantedness' (প্রাক্-অবহিতি) আছে। সুতরাং প্রশ্ন হলো তাহল কেন আমরা এই দৈনন্দিন সম্বন্ধে পরিচয়ের গন্ডিকে অতিক্রম করব এবং কেন এই সম্বন্ধে প্রশ্ন করব? গারফিঙ্কেল মনে করেন সাধারণভাবে গৃহীত এই দৈনন্দিনের জগতকে বোঝার জন্যই এই সম্বন্ধে প্রাক্-অবহিতি 'taken for granted'প্রয়োজন। 'প্রাক-অবহিতি' আছে এক বিষয়গুলি সম্বন্ধে প্রশ্ন করতে হবে। সাধারণভাবে গৃহীত ধারণাকে প্রশ্ন করলে মানুষের সামাজিক জগৎ সম্বন্ধে ধারণায় চিড় ধরে। তার কারণ যে ভাবে আমরা কোনো পরিস্থিতিকে ব্যাখ্যা করে থাকি সেই সাধারণভাবে গৃহীত ভাবনার বদলে অন্য কোনো ভাবনা না থাকায় আমাদের কাছে সেই সূত্রে গাঁথা সামাজিক জীবনের ধারণা ভেঙে যায়। এথনোমেথোডলজি মনে করে মানুষ যে পদ্ধতিতে এই জগৎ সম্বন্ধে ধারণায় সাধারণভাবে গৃহীত ভাবনা দিয়ে গড়ে তোলে, সেই পদ্ধতির মূল্যায়ণ ও ব্যাখ্যা

করে। এই তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গিটি বেশিরভাগ সমাজতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের থেকে পৃথক ভাবে সমাজ ও সমাজ গঠনের প্রক্রিয়াকে পরীক্ষা করে।

2.2. মূলধারা সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি ও এথনোমেথোডোলজি (Mainstream perspective and Ethnomethology)

এমিল দুর্খাইন যেভাবে সামাজিক ঘটনাকে অনুধাবনের কথা বলেন, গারফিঙ্কেল তার বিপরীতে দেখান যে এই সামাজিক জগতের কোনো নিরপেক্ষ অস্তিত্ব নেই। এবং এই সামাজিক জগৎ 'sui generis' (অনন্য, অদ্বিতীয়) নয়। বরং তারা মনে করেন দৈনন্দিন জীবনে ব্যক্তি সামাজিক ঘটনার ব্যাখ্যা করেন শুধুমাত্র ঐ পরিস্থিতিতে নিজের মত করে। ব্যক্তি যখন কোনো পরিস্থিতিকে চিহ্নিত করেন তখন সেই পরিস্থিতিতে গ্রাহ্য সামাজিক নিয়মগুলিও তিনি মেনে চলেন। এই মান্যতার মধ্যে দিয়ে সামাজিক বাস্তবতারও সৃষ্টি হয়। গারফিঙ্কেল ক্রিয়াবাদী তত্ত্বের (functionalist theory) সমালোচনা করে বলেন সামাজিক ঘটনার নিজস্ব কোনো পরিচয় থাকে না। বরং ক্রিড়কের (actor) অর্থদানের মধ্যে দিয়েই এই বাস্তব স্বীকৃতি পায়। এথনোমেথোডোলোজিতে এভাবে দেখা হয় না যে কীভাবে এবং কোন্ প্রক্রিয়ায় মিথস্ক্রিয়া প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভূমিকা পালন সম্বন্ধীয় প্রত্যাশা গড়ে ওঠে। বরং প্রতীকী মিথস্ক্রিয়াবাদীর এই দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তে এথনোমেথোডোলোজিতে দেখা হয় কোন্ প্রক্রিয়ায় মানুষ ব্যবহারের সাধারণভাবে গৃহীত নিয়মগুলিকে গড়ে তোলে ও একটি মিথস্ক্রিয়া পরিস্থিতিকে অর্থপূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করে। এথনোমেথোডোলোজি দৃষ্টিভঙ্গিতে মনে করা হয় মিথস্ক্রিয়া প্রক্রিয়াটিই গবেষণার যোগ্য। কোনো ক্রিয়াবাদী তাত্ত্বিক যদি দেখতে চান একজন ক্রীড়কের ক্ষেত্রে তার মিথস্ক্রিয়ায় কীভাবে কোনো পরিস্থিতি বা ঘটনায় নিয়মগুলি কার্যকর হচ্ছে তা দেখা, এর বিপরীতে এথনোমেথোডোলোজি দেখতে চায় সামাজিক ঘটনাকে ব্যক্তি কীভাবে আত্মস্থ করছে তা নয়, বরং মানুষ মানুষের সঙ্গে কীভাবে মিথস্ক্রিয়ায় রত হন ও একে অপরের কাছে কীভাবে প্রমাণ করেন যে তারা প্রত্যেকেই সামাজিক নিয়মগুলিকে আত্মস্থ করেছেন।

2.3. প্রতীকী মিথস্ক্রিয়াবাদ ও এথনোমেথোডোলজি (Symbolic Interactionism and Ethnomethology)

প্রতীকী মিথস্ক্রিয়াবাদের মত এথনোমেথোডোলজিতে একটি সামাজিক-মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি। কিন্তু যেভাবে এরা প্রশ্ন উত্থাপন করে, তা প্রতীকী মিথস্ক্রিয়াবাদের থেকে আলাদা। এথনোমেথোডোলজিস্টরা সর্বক্ষণ এমন প্রশ্ন বা পরিস্থিতির অনুসন্ধান করেন যেখানে অর্থদান প্রক্রিয়া চলে। প্রতীকী মিথস্ক্রিয়াবাদী হার্বার্ট মীড দেখান কীভাবে ব্যক্তি অপর ব্যক্তির মনের ভাব আন্দাজ করে মিথস্ক্রিয়া ঘটান। এথনোমেথোডোলোজির দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা হয় কোনো পরিস্থিতিকে ব্যক্তি কীভাবে অর্থপূর্ণ করে তোলেন। সেক্ষেত্রে শুধুমাত্র যার সঙ্গে মিথস্ক্রিয়া ঘটাচ্ছেন তার মনের ভার আন্দাজ করা হয় না।

দুটি দৃষ্টিভঙ্গিতেই গুণগত তথ্যের উত্থাপন ও উৎপাদন করা হয়। পরিমাণগত তথ্য উৎপাদন, ব্যাখ্যা

ও ব্যবহারের বিপক্ষে এই দুটি প্রেক্ষিতেই অন্তর্নিহিত বোধের ব্যাখ্যায় তৎপর থাকে। এই অন্তর্নিহিত বোধের ব্যাখ্যাদায়ী দৃষ্টিভঙ্গি হিসাবে, জ্ঞান আহরণের পদ্ধতি হিসাবে, দুটি দৃষ্টিভঙ্গিই সমসাময়িক সময়ের গবেষণার গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। দুটি দৃষ্টিভঙ্গিতেই অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ, কেস্ স্টাডি, গভীরতাপূর্ণ সাক্ষাৎকার পদ্ধতি জীবন-আলেখ্য ব্যাখ্যা প্রভৃতি পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। এক কথায় বলতে গেলে এথনোমেথোডলজি সেই পদ্ধতি যা সরাসরি অংশগ্রহণ না করলে সম্ভব নয়। জর্জ স্থাস্ (George Psathas) ১৯৭৬ এ লেখা প্রবন্ধে (Misinterpretung Ethnomethodology) বলেছেন যে সাঁতার কাটতে হলে যেমন জলে নামতে হয় তেমনি এথনোমেথোডলজি বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে হলে সরাসরি অংশগ্রহণ করতে হয়।

এথনোমেথোডলজির একটি রূপ হিসাবে কথোপকথন বিশ্লেষণ (Conversation Analysis) প্রাত্যহিক বা দৈনন্দিন জীবনের একঘেয়ে মুহূর্তবিশিষ্ট বিষয় যেমন কথোপকথনকে বিশ্লেষণ করে। কথোপকথন বেশীরভাগ সময়ই প্রতীকী। এখানেই এথনোমেথোডোলজির সঙ্গে প্রতীকী মিথষ্ক্রিয়াবাদের সম্পর্ক। কথোপকথন বিশ্লেষণে গবেষকরা শুধুমাত্র শব্দ, শব্দ বন্ধ বা বক্তব্যের কি আদান-প্রদান হচ্ছে তাতে আগ্রহী নন। তারা কথার মাঝখানে 'চুপ করে থাকা', দীর্ঘশ্বাস ফেলার মত অমৌখিক বিষয়কেও প্রাধান্য দেন। তাদের কাছে ঐ ক্রিয়াও যথেষ্ট গুরুত্ব পায় যেমন কোন্ কথা কিভাবে বলা হলো ইত্যাদি। দুটি ক্ষেত্রই প্রতীকি মিথষ্ক্রিয়াবাদী বিশ্লেষণের দৃষ্টিভঙ্গিতেও গুরুত্বপূর্ণ। জর্জ হার্বার্ট মীড (George Herbert Mead) কথোপকথনে 'মন' (Mind) কে গুরুত্ব দিয়েছিলেন। ঠিক একই ভাবে, কথোপকথন বিশ্লেষণেও মানসিক প্রক্রিয়ার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। যেহেতু কথোপকথন যৌথ ক্রিয়া এবং একজনের বক্তব্যের পৃষ্ঠে অন্যজনের বক্তব্যকে বিশ্লেষণ, অনুধাবন ও অর্থদান করা হয় সেহেতু কথোপকথন বিশ্লেষণেও প্রতীকের সাহায্য কিভাবে কথোপকথন এগোচ্ছে তা দেখা হয়ে থাকে। ফলে অনু ক্ষেত্রের বিশ্লেষণে, নিযুক্তি (agency) ও কাঠামো (structure)-র বিশ্লেষণে দুটি দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে বৌদ্ধিক ক্ষেত্রে যথেষ্ট সহযোগীতাপূর্ণ অবস্থান লক্ষ্য করা যায়।

2.4. বিভিন্ন ধরনের এথনোমেথোডোলজি (Various forms of Ethnomethology)

'এথনোমেথোডলজি' গারফিঙ্কেলের আবিষ্কার হলেও ১৯৬৭ সালে 'Studies in Ethnomethodology' বইটি প্রকাশের পর ওই দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপক জনপ্রিয়তা ঘটে। ডন জিম্যারম্যান (Don Zimmerman) ১৯৭৮ সালে বলেন যে এই দৃষ্টিভঙ্গি বহু ও বিভিন্নভাবে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। ১৯৯১ সালে মেনার্ড ও ক্লেম্যান (Maynard and Clayman) বিভিন্ন ধরনের এথনোমেথোডোলজি সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক প্রেক্ষিতে গৃহীত এথনোমেথোডলজিক্যাল গবেষণার উল্লেখ করেন। গারফিঙ্কেল যেমন তার ছাত্রদের নিয়ে সাধারণ গৃহকোণের মধ্যে তার গবেষণাকে সীমিত রেখেছিলেন, তার পরবর্তিতে এই দৃষ্টিভঙ্গি নির্ভর গবেষণা অপ্রাতিষ্ঠানিক অঙ্গন ছেড়ে হাসপাতাল, থানা, কোর্ট ইত্যাদি প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রেও সংগঠিত হয়। এই সব গবেষণার লক্ষ্য গুলো বিধিবদ্ধ ক্ষেত্রে মানুষ যেভাবে কাজ করেন এবং এই সব কাজের মধ্যে দিয়ে কীভাবে প্রাতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়া, প্রতিষ্ঠানের সংগঠন বজায় থাকে তা দেখা। প্রথাগত মূলধারার সমাজতত্ত্বের সংগঠন বিষয়ক আলোচনায় যেমন সংগঠনের কাঠামো, বিধিবদ্ধ নিয়ম, বিধিবদ্ধ প্রণালীর

প্রেক্ষিতে মানুষ কি করেন তার ব্যাখ্যা হয় এথনোমেথোডলজির দৃষ্টিভগি থেকে এই সব বাহ্যিক বাঁধা প্রাতিষ্ঠানিক কাজকর্মকে কীভাবে ব্যাহত করে সেই আলোচনার মধ্যে সীমিত থাকে না। বরং মানুষ কীভাবে এত বাঁধা বিপত্তির মধ্যেও তাদের কাজ শেষ করেন এবং প্রতিষ্ঠানের প্রক্রিয়াসমূহকে বজায় রাখেন তার আলোচনাই এথনোমেথোডলজিতে করা হয়।

এথনোমেথোডলজি দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দ্বিতীয় যে বিষয়ে গবেষণা বহু ব্যপ্তি লাভ করেছে তা হলো কথোপকথন বিশ্লেষণ (Conversation Analysis)। কথোপকথন (Conversation) হলো এমন এক মিথষ্ক্রিয়া সেখানে স্থিতিস্থাপকতা, স্থিতাবস্থা দুই রক্ষিত হয়। কথোপকথন বিশ্লেষণের লক্ষ্য হলো যা বলা হলো তার থেকে যা বলা না হয়েও একে অপরে সব বুঝতে পারলেন সেই প্রক্রিয়ার বিশ্লেষণ করা।

2.5. মূলধারার সমাজতত্ত্বের সমালোচনা (Criticisms of Mainstream Sociology)

এথনোমেথোডলজি ঐতিহ্যবাহী সমাজতত্ত্বের সামাজিক জগৎ সম্বন্ধে অনুধাবনের উপায়কে সমালোচনা করে। তারা মনে করেন, সমাজতত্ত্ব দৈনন্দিন জীবনের প্রতি তাকে বিশ্লেষণের প্রতি তেমন মনোযোগ দেয়নি। বরং তারা দৈনন্দিন জীবনের ব্যবহারকে চাপা দিয়ে এমন এক জগতের গঠনের ওপর বিশেষ জোর দিয়েছেন যাতে মানুষের প্রতিদিনের জীবনের আলেখ্যকে পাওয়া যায় না। ফলে সমাজতাত্ত্বিকরা গোষ্ঠী জীবনের সদস্য হিসাবে কেমন দিন যাপন করেন তা কখনোই তাদের লেখনীতে স্থান পায়নি। তাদের বাস্তব থেকে তাদের গবেষণায় যে বাস্তব উঠে এসেছে দুটি ভিন্ন জগৎ হয়ে পড়েছে। মেহান ও উড (Mehan and Wood) ১৯৮৬ সালে এই বিষয়টিকে চিহ্নিত করে বলেছেন যে একটি সামাজিক বিজ্ঞান গঠন করতে গিয়ে সমাজতত্ত্ব নিজেকে 'সামাজিক' বিষয়ের থেকে দূরে নিয়ে এসেছে। সমাজতাত্ত্বিকরা সমাজকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে এমন কিছু শব্দ, ধারণা বা প্রত্যয়ের ব্যবহার করছেন যা আদতে সামাজিক জীবনের ওঠা পড়া, ঘাত-প্রতিঘাতকে তেমন করে মেলে ধরতে পারেনি। এমনকি সমাজতাত্ত্বিকরা সামাজিক বাস্তবকে সাংকেতিকভাবে যখন বর্ণনা করেন তখনও বা পরিসংখ্যার সাহায্যে যখন প্রকাশ করেন তাদের বিশ্লেষণ সঠিক হলেও বিমূর্ত, জটিল ও অনেক সময়ই ভ্রান্তিমূলক হয়ে যায়। সুতরাং এথনোমেথোডলজি-তে মনে করা হয় সামাজিক জগৎ পরিস্থিতি, পরিবেশ সম্বন্ধে বিবরণ নয় বরং ঐ পরিস্থিতি পরিবেশের মধ্যে থেকে তার অংশ হিসাবে পরিস্থিতি ও পরিবেশ সম্বন্ধে বলা প্রয়োজন।

ঐ পরিস্থিতির অংশ হিসাবে, পরিস্থিতিকে ব্যাখ্যা করায় আলাদা কোনো পদ্ধতি না ব্যবহার করে, সাধারণভাবে অন্য সদস্যরা যেভাবে তার ব্যাখ্যা করছেন সেই পদ্ধতি অবলম্বন করলে দৈনন্দিন জীবন থেকে পৃথক কোনো সামাজিক বাস্তব গড়ে ওঠে না।

ডন জিমারম্যান (Don Zimmerman) ও মেলভিন পলনার (Melvin Pollner) ১৯৭০ সালে বলেছেন যে ঐতিহ্যবাহী সমাজতত্ত্ব বিষয় (topic) ও উৎসের (resource) মধ্যে গণ্ডগোল করে ফেলেছে। দৈনন্দিন জীবন একটি উৎস (resource) যার মধ্যে থেকে সমাজতাত্ত্বিক বিষয় (topic) বাছাই করা যায়, কিন্তু ঐতিহ্যবাহী সমাজতত্ত্বে খুব কমই তা করা হয়েছে। যেমন ১৯৭০ সালে ম্যাথু স্পিইয়ার (Mathew Speier) দেখিয়েছেন সমাজতাত্ত্বিকরা যখন শৈশবের সামাজিকীকরণ আলোচনা করেন এখন সেই প্রক্রিয়াকে

না দেখে তারা কতগুলি বিমূর্ত ধাপ যা ঐ প্রক্রিয়া থেকেই সাধারণীকরণের (generalization) মাধ্যমে গৃহীত তা নিয়ে আলোচনা করেন। এথনোমেথোডলজি-র দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখলে তারা দেখতে চাইবেন শিশু সামাজিকীকরণের মাধ্যমে কিভাবে নানা ধরনের দক্ষতাকে আহরণ করে এবং দক্ষ হয়ে ওঠে এবং সেক্ষেত্রে অবশ্যই দৈনন্দিন জীবন তাদের কাছে সেই উৎস। এথনোমেথোডলজিতে মনে করা হয় সামাজিক স্তরের মধ্যে নিজস্বতা কিছু নেই বরং সামাজিক ক্রীড়কদের কর্ম সম্পাদনা (accomplishment) গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ এথনোমেথোডলজির দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ক্রীড়কের দৃষ্টিতে একঘেয়ে কাজে কার্যকারণ সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা সমাজতত্ত্বের উদ্দেশ্য হতে পারে না বরং দেখা দরকার সমাজস্থ মানুষ কিভাবে তাদের জীবন ও জগতকে দেখে, বর্ণনা করে ও বিশ্লেষণ করে থাকেন।

2.6. এথনোমেথোডলজির মূল নীতিসমূহ (Main Principles of Ethnomethodology)

এথনোমেথোডলজির কতগুলি মৌলিকতা আছে যেগুলিকে এই দৃষ্টিভঙ্গির মৌলিক উপাদান বলা যেতে পারে। এই নীতিগুলি হলো—

১। **প্রতিবর্তক (Reflexive action) ক্রিয়া ও মিথষ্ক্রিয়া :**

বেশিরভাগ মানব মিথষ্ক্রিয়াই হলো প্রতিবর্তক (reflexive)। মানুষ মাত্রেই ইশারা (cues), অঙ্গভগি (gesture), শব্দ (words) ও অন্যান্য তথ্যের (information) আদান প্রদান করে কোন এক বাস্তবের বিশেষ উদ্দেশ্য। এমনকি কোন ধরনের বিপরীতমুখী প্রমাণকেও প্রতিবর্তক (reflexively) ব্যাখ্যা করা হয় জ্ঞান ও বিশ্বাসকে বজায় রাখার (maintain) ক্ষেত্রে। প্রতিবর্তকতা (reflexivity) মাধ্যমে বোঝা যায় মিথষ্ক্রিয়ার মাধ্যমে মানুষ কিভাবে বিশেষ বাস্তব সম্বন্ধে ভাবনা বজায় (maintain) রেখে তারা সেই বাস্তবের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছেন।

২। **অর্থদানের সূচনীয়তা (indexicality) :** ভাবভঙ্গি, ইশারা (cues) শব্দ ও অন্যান্য তথ্য যেভাবে প্রেরিত হচ্ছে ও গৃহীত হচ্ছে তার অর্থ কোন বিশেষ প্রেক্ষিতের বা পরিপ্রেক্ষিতে আছে। প্রেক্ষিতের উপস্থিতির জ্ঞান ছাড়া মিথষ্ক্রিয়ারত ব্যক্তিদের প্রতীকি মিথষ্ক্রিয়ার কোন অর্থ হয় না।

৩। **স্বাভাবিক (normal) ধরনের অনুসন্ধান :** যা বাস্তব তা সম্বন্ধে কোনো অস্পষ্টতা আছে, এ কথা যদি মিথষ্ক্রিয়ারত ব্যক্তিরা বুঝতে পারেন তাহলে তারা যা ‘স্বাভাবিক’ (normal) তা অনুসন্ধানের চেষ্টা করবেন। যে কোনো পরিস্থিতিতে ‘স্বাভাবিক’ অবস্থা কি তা তাদের ধারণায় থাকে এবং ফলে তা পাওয়ার জন্য বা সৃষ্টির জন্য তারা উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকেন।

৪। **দৃষ্টিভঙ্গির ব্যতিহার (reciprocity) :** ক্রীড়করা এমন এক অনুমান (presumption)-এ চলেন যে জায়গার পরিবর্তনে অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে কোনো পার্থক্য হয় না। ফলে দৃষ্টিভঙ্গির ব্যতিহার

(reciprocity) হতে পারে এমনই ভাবনা তারা ভাবভঙ্গির মাধ্যমে মিথষ্ক্রিয়ারতকালে একে অপরকে বোঝান।

৫। **'ইত্যাদি'-র (etcetera) নীতি :** অপরের কাজ ও কথার অর্থ বোঝার জন্য ক্রীড়ক (actor) অনেক সময়ই অপেক্ষা করেন। যখন তারা এই অপেক্ষা করেন, তাকেই 'ইত্যাদি'-র (etcetera) নীতি বলা হয়। অর্থাৎ মিথষ্ক্রিয়াতে কোনভাবে বন্ধ করে না দিয়ে তা একে অপরের খামতিগুলিকে ঢেকে দেওয়ার চেষ্টা করেন।

2.7. এথনোমেথোডলজির সমালোচনা (Criticisms against Ethnomethodology)

বর্তমানে এথনোমেথোডলজি দৃষ্টিভঙ্গির বক্তব্য যতটা গৃহীত হয়েছে এর শুরুতে বৌদ্ধিক মহলে তেমন গ্রহণযোগ্যতা ছিল না। ফলে সেই সময়ে ঐতিহ্যবাহী বহু সমাজতাত্ত্বিকের কাছেই তা খুব সামান্য ও সাধারণ, ছেলেমানুষ বিষয় হিসাবে গৃহিত ছিল। তাদের কাছে দৈনন্দিন জীবনকে জানতে চাওয়ার থেকেও গুরুত্বপূর্ণ হলো বৃহৎ সামাজিক ক্ষেত্রে কাঠামো ও প্রক্রিয়ার আলোচনা করা। এর উত্তরে এথনোমেথোডলজি দৃষ্টিভঙ্গি মনে করে তারা দৈনন্দিন নিয়ে আলোচনা করে কারণ এই বিষয়টি ও প্রেক্ষিতটিই সব কিছুর ভিত্তি এবং অধ্যয়নের প্রয়োজনীয় উৎস। আবার অন্য সমালোচকরা যেমন ১৯৮৮ সালে অ্যাটকিন্‌সন্ (Atkinson) দেখিয়েছেন যে এথনোমেথোজলজি প্রকৃত অর্থে তার প্রপঞ্চবাদী উৎসকে ভুলে গেছে। বস্তুত দৈনন্দিন জীবনের সচেতন প্রক্রিয়াকে ভুলে গিয়ে তারা বিশেষত কথোপকথন বিশ্লেষক অর্থাৎ কথোপকথনের কাঠামো নিয়ে বিশ্লেষণে বেশি ব্যস্ত। এই কাঠামো বিশ্লেষণে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার অন্তর্নিহিত প্রেরণা ও প্রেষণা (motivation) কোনও কিছুই বিশ্লেষণের মধ্যে অন্তর্গত হচ্ছে না। ফলে এথনোমেথোডলজিও ক্রমশ বাস্তবগ্রাহ্য বিষয় নিয়ে বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

তৃতীয় যে বিষয়টি নিয়ে এথনোমেথোডলজি দৃষ্টিভঙ্গি খুবই ব্যাপ্ত তা হলো তাদের কাজের সঙ্গে বৃহত্তর সামাজিক কাঠামোর সম্পর্ক স্থাপন। অর্থাৎ এথনোমেথোডলজি অনু-ক্ষেত্রে সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে ব্যাস্ত থাকে বলে তার সঙ্গে সামগ্রিক বা নিখীল ক্ষেত্রকে সম্বন্ধিত করার চেষ্টা না থাকলে সামগ্রিকতার বিচারে অনু-ক্ষেত্র বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এছাড়াও এথনোমেথোডলজির নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি থেকে স্ব-সমালোচনা হয়ে থাকে। যেমন বলা হয় যে এথনোমেথোডলজি প্রকৃত অমূল্যসংস্কারবাদী প্রতিবর্তকতাকে ক্রমশ বাতিল করছে। অমূল্যসংস্কারবাদী প্রতিবর্তকতায় বলা হয় যে সব সামাজিক ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। অর্থাৎ তাদের নিজেদের কাজকেও সমালোচনা করার প্রয়োজন। তারাও গবেষণাটি সম্পাদন করেন। অর্থাৎ সেটিও ক্রিয়া এবং সেটিও একটি বা বহুত্ববাদী প্রেক্ষিতেই ঘটে থাকে। ফলে এথনোমেথোডলজি ক্রমশ স্ব-বিশ্লেষণ ও সমালোচনামুখী আলোচনার ধার হারিয়ে ফেলছে। যত সময় যাচ্ছে ততই এথনোমেথোডলজির সঙ্গে কথোপকথন বিশ্লেষকদের মধ্যে পার্থক্য বেশি করে স্পষ্ট হয়ে উঠছে। বাস্তবগ্রাহ্য উপায়ে সমাজতত্ত্বের মূলধারার গবেষণায় যত বেশি করে কথোপকথন বিশ্লেষণ মান্যতা পাচ্ছে ততই এই পার্থক্য স্পষ্ট হচ্ছে। ফলে, এথনোমেথোডলজি দৃষ্টিভঙ্গির একটি বিশেষ রূপ হিসাবে গড়ে উঠেও কথোপকথন বিশ্লেষণ

সমাজতত্ত্বের মূলধারার ভাবনায় জায়গা করে নিচ্ছে এবং এথনোমেথোডলজি পড়ে থাকছে প্রান্তিক চিন্তার ও ভাবনার অঙ্গনে।

2.8. এথনোমেথোডলজি ও অনু-নিখীল ব্যবস্থা (Ethnomethodology and Micro-Macro Order)

এথনোমেথোডলজিকে অনু-ক্ষেত্রের বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গি হিসাবে অভিহিত করলেও এথনোমেথোডলজির দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অনু-ক্ষেত্র ও নিখীল ক্ষেত্রের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয় না। অর্থাৎ এথনোমেথোডলজি দৃষ্টিভঙ্গি তাদের চিহ্নিত বিষয়বস্তুগুলিকে কখনোই অনু-ক্ষেত্রের বিষয়বস্তু বলে আলাদা করে চিহ্নিত করেনি। মূলধারার গবেষণা ও সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্বের বৃহত্তর, সার্বিক, সামগ্রিকভাবে সমাজের আলোচনার তুলনায় এথনোমেথোডলজির দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিশ্লেষণ অবশ্যই কৌতুক উদ্দীপক, আমূলসংস্কারবাদী একটি দৃষ্টিভগি। তারা কখনোই অনু ক্ষেত্র ও নিখীল ক্ষেত্রের মধ্যে পার্থক্য করেননি বা দুটি যে একই সে কথাও বলেননি। তারা শুধুমাত্রই তাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। মূলধারার সমাজত্তত্বকে সমালোচনা করেছেন ঠিকই কিন্তু তা শুধুই নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গির যৌক্তিকতাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য।

2.9. এথনোমেথোডলজি কি একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি, একটি পদ্ধতিবিদ্যামাত্র নাকি একটি নতুন সংযোজন? (Is Ethnomethodology a new perspective only a methodology or a new addition?)

ঐতিহ্যবাহী সমাজতত্ত্বের আন্তঃব্যক্তিগত প্রক্রিয়ার সম্বন্ধে ধারণা গঠনে ব্যার্থ হয়েছে, সে ক্ষেত্রটি এথনোমেথোডলজি তুলে ধরেছে। সামাজিক মিথস্ক্রিয়ায় মানুষের কি ধরনের অনুধাবন পদ্ধতি নিহিত থাকে সেই বিষয়ে অনুসন্ধান একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। এই তত্ত্বের লক্ষ্য হলো সাধারণ মানুষের কোন পদ্ধতি ব্যক্তি ব্যবহার করে সেই পরিস্থিতিকে অনুসন্ধান করা। এ ক্ষেত্রে এথনোমেথোডলজির কিছু নীতি প্রতীকী মিথস্ক্রিয়াবাদ, ভূমিকাতত্ত্ব (Role theory) ইত্যাদি তাত্ত্বিক ধারার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। কিন্তু তারা যেভাবে প্রতিষ্ঠা করতে উদ্যোগী হন যে তাদের অনুসন্ধানের ক্ষেত্রটিই একমাত্র বাস্তবক্ষেত্র সেক্ষেত্রে তাদের যুক্তি গ্রহণযোগ্য থাকে না। আবার এ কথাও সত্যি যে এথনোমেথোডলজিকে বহু ক্ষেত্রেই ভুল বোঝা হয়েছে। কেউ কেউ মনে করেন ঐতিহ্যবাহী সমাজতত্ত্বের ত্রুটি বা ভ্রান্তিকে সংশোধন করাই এথনোমেথোডলজির লক্ষ্য। তাদের লক্ষ্য কিন্তু কখনোই অন্যের ব্যবহৃত পদ্ধতির বিশ্বাসযোগ্যতা বা নির্ভরতা যাচাই করা নয়। বরং সাধারণ মানুষ কীভাবে বিশ্ব বা জগৎ সম্বন্ধে ধারণার গঠন করার ক্ষেত্রে পদ্ধতি গ্রহণ করেন তা অনুসন্ধান করা। আবার এমন কেউ আছেন যারা মনে করেন এটি একটি গবেষণার জন্য ব্যবহারযোগ্য হাল্কা পদ্ধতি। তাদের কাছে প্রতীকী মিথস্ক্রিয়াবাদের গবেষণার জন্য ব্যবহার্য পদ্ধতিই হলো এথনোমেথোডলজি। আবারও এ'কথাই বলতে হয় যে এই দৃষ্টিভঙ্গিতে নতুন কোনো পদ্ধতি মানুষের সংজ্ঞায়িত বাস্তবকে অনুসন্ধান করতে সাহায্য করে তা নয় বরং সামাজিক বিশ্বের সামাজিক স্থিতিকে কিভাবে তাদের মিথস্ক্রিয়ার মধ্যে মানুষ সৃষ্টি করে, বজায় রাখে এবং পরিবর্তন করে, সেই পদ্ধতির অনুসন্ধান। এটি অন্য কোন তাত্ত্বিক প্রেক্ষিতের সংযোজনকারী পদ্ধতি বা বিস্তৃত প্রেক্ষিত নয়, নিজেই একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি।

Unit 3 ❐ Contributions of Schutz

গঠন

3.1. শুটজের প্রপঞ্চবাদ (Schutz's Phenomenology)

3.2. স্বাভাবিক আচরণ (Natural attitude)

3.3. অর্থদান করণ (Giving meaning)

3.1. শুটজের প্রপঞ্চবাদ (Schutz's Phenomenology)

অ্যালফ্রেড শুটজ (১৮৯৯-১৯৬৯) হুসারেলের প্রপঞ্চবাদী দর্শনের থেকে ভিন্ন মাত্রার সমাজতাত্ত্বিক প্রপঞ্চবাদী দৃষ্টিভগি গড়ে তোলেন। তিনি তার সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গিতে ওয়েবারের 'ভার্স্টিহেন' (Verstehen)-এর ধারণাকে ব্যবহার করেন। সামাজিক সমস্যা বিশ্লেষণে হুসারেলের প্রপঞ্চবাদী দর্শনকে কাজে লাগিয়ে শুটজ দেখান যে সামাজিক জীবনের ভিত্তি গড়তে ও তার সম্ভাবনাকে সমৃদ্ধ করতে ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির অভিজ্ঞতা ও ভাগ করে দেওয়া অর্থদান প্রক্রিয়া সম্বন্ধিত ধারণার ব্যবহার দরকার। ১৯৬৭ সালে প্রকাশিত 'দি ফেনোমেনোলজি অব দি সোশ্যাল ওয়ার্ল্ড' গ্রন্থে ও পরবর্তীতে তিনি দেখান দৈনন্দিন জীবনে ব্যক্তি বহুবার একই ক্রিয়া করেন। এই দৈনন্দিন প্রাত্যহিক একঘেয়ে (repetitive) সামাজিক ঘটনাগুলি বস্তুত একটি সামাজিক প্রক্রিয়া। এই প্রতিনিধিত্ব (typical) প্রক্রিয়ার ঘটনাকে বর্গিকৃত করতে হবে তার সামাজিকভাবে গৃহীত অর্থদান ও সমষ্টিগতবাবে ভাগ করে নেওয়া অর্থদানের ভিত্তিতে। মুখোমুখি সম্পর্কে, এই বর্গিকৃত প্রতিনিধি (typifications) কতগুলি বিশেষ (unique) ঘটনার প্রেক্ষিতে সজ্জিত করা যেতে পারে। এর থেকেও বোঝা যাবে যে একটি সম্পর্কের প্রকৃতি যত ব্যক্তিগত হবে ততই তার অনুপম বিশেষ (unique) চরিত্র ফুটে উঠবে এবং পাশাপাশি যত কোনো সম্পর্ক নৈর্ব্যক্তিক হবে ততই সেটি প্রতিনিধি (typical) হয়ে উঠবে।

শুটজ মনে করেন দৈনন্দিন জীবন বিশ্লেষণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শুটজের কাছে তার জীবন বিশ্ব/বাস্তবতা (life world) হচ্ছে সেই বাস্তবতা যাকে হুসারেল ব্র্যাকেট (bracket) করতে বলেছেন। এই বাস্তবতা প্রকৃত অর্থে সংস্কৃতির দ্বারা নির্ধারিত ও সাংস্কৃতিক অর্থদানে এক বিশিষ্টতা অর্জন করে। শুটজ মনে করেন, মানব বিশ্ব যেভাবে আমাদের কাছে বিশ্লেষিত হয় সেভাবেই তাকে উপস্থিত করা দরকার। প্রাত্যহিকতার বা দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ জ্ঞান দ্বারা নির্মিত এই বাস্তবতা। শুটজ প্রশ্ন তোলেন যে সাধারণ মানুষ কীভাবে এই জীবন-বিশ্ব সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জন করেন? এই জীবন-বিশ্ব (life world) প্রতিটি মানুষের তাৎক্ষণিক অভিজ্ঞতালব্ধ বিশ্ব। এটি একটি সাংস্কৃতিক জগৎ যা কতগুলি অনুমান (assumptions), বিশ্বাস (beliefs), অর্থপ্রদানের (meanings) মধ্যে দিয়ে মানুষের কাছে তাদের দৈনন্দিন জীবনে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে বাঙ্ময় হয়ে ওঠে। সাধারণ মানুষ এই বিশ্বকে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জানেন প্রাথমিকভাবে এর প্রতি স্বাভাবিক প্রবণতার (natural attitude) মাধ্যমে। 'স্বাভাবিক প্রবণতা' হলো এমন

এক প্রবণতা যেখানে চারপাশের বিশ্বকে 'প্রাক্ অবহিতি' বা 'taken for granted' এই নীতিতে সংগঠিত, যেখানে যে কোনো ধরনের দ্বিধা-র (doubts) বিলম্বন (suspended) থাকে। শুটজের মতে 'স্বাভাবিক প্রবণতার' প্রকাশে বা ব্যবহারে মানুষ যে কোনো ধরনের দ্বিধাকে 'ব্রাকেট' (bracket) করে রাখে। বিভিন্ন ধরনের জগতের অভিজ্ঞতাতেও দ্বিধা-র (doubt) বিলম্বন (suspended) থাকতে পারে। যেমন, আমরা জানি মানুষ বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে নানা ধরনের বিশ্বাস পোষণ করেন। প্রকৃত অর্থে অভিজ্ঞতালব্ধ বাস্তবের থেকে এই বাস্তব সম্বন্ধীয় বিশ্বাসের জগৎ কিন্তু পৃথক। কিন্তু যখন মানুষ এই বিভিন্ন ধরনের বাস্তবতাকে অনুধাবন করেন তখন সেই বিভিন্নতাকে কখনোই দ্বিধার কারণে প্রশ্ন করেন না বরং জীবনে দ্বিধা ও বাস্তব দুটিকে পাশাপাশি নিয়েই এগোতে থাকেন।

3.2. 'স্বাভাবিক আচরণ' (Natural attitude)

'স্বাভাবিক আচরণ' (Natural attitude) হলো এমন এক কৌশল (device) যার মাধ্যমে আমাদের জগৎ নিজেদের কাছে বাস্তব ও সত্য হয়ে ওঠে। সচেতন থেকে, দ্বিধান্বিত না হয়ে, কাজের মধ্যে ব্যাস্ত থাকার মাধ্যমে, আন্তঃআত্মবাদীতার মাধ্যমে এই 'স্বাভাবিক আচরণ' (Natural attitude) অভ্যাস হয়। এই 'স্বাভাবিক আচরণ' (Natural attitude) আমরা চিন্তাভাবনা না করেই এমন কিছু বর্ণ প্রতিনিধিত্বমূলক (typifications), ভূমিকা সামাজিক প্রণালী ও দক্ষতা অর্জন করি ততক্ষণ যতক্ষণ আমাদের দৈনন্দিন জীবন-অভিজ্ঞতায় কোনো ছেদ পড়ে না। অন্য কথায় বলতে গেলে 'স্বাভাবিক আচরণ' (Natural attitude) আমাদের সামাজিক বিশ্ব সম্বন্ধ এমন এক প্রাক্-অবহিতির (taken-for-grantedness) সৃষ্টি করে যে আমাদের সামাজিক জগতের সব কিছুই 'স্বাভাবিক' রূপে আমাদের কাছে প্রতিপন্ন হয়। এই প্রাক্-অবহিতি (taken-for-grantedness) তখনই ব্যাহত হয় যখন আমাদের দৈনন্দিনের বিধি (routine) বিঘ্নিত হয়। যখনই এমন কোনো বিঘ্ন ঘটে, মানুষ তার উত্তর অনুসন্ধানের চেষ্টা করে এবং বিধি (routine) পুনস্থাপনের উদ্দেশ্য আবার সক্রিয় হয় এবং এভাবেই 'স্বাভাবিক আচরণ' (Natural attitude) পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়।

3.3. অর্থদান করণ (Giving meaning)

আমাদের এই সামাজিক জগৎ, শুটজের কাছে একটি অর্থপূর্ণ জগৎ। তার কারণ এই জগৎ একটি সাধারণ, সরল, শুধুমাত্র জৈবিক ও ভৌত পদার্থের উপস্থিতিপূর্ণ এক জগৎ নয়। আমরা অর্থপ্রদান করি বলেই কাগজের টাকার এত মূল্য, জৈবিক যৌনক্রিয়ার মাধ্যমে ভালোবাসা ও প্রেম অথবা অত্যাচার প্রকাশ পায়। অর্থাৎ বিভিন্ন ধরনের বস্তু ও অভিজ্ঞতার ওপর অর্থপ্রদানের মাধ্যমেই এই সামাজিক জগৎ অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে এবং শুধুমাত্র ভৌত ও জৈবিক উপাদানের সংগঠনের থেকে বেশি কিছু হিসাবে প্রতিপন্ন হয়। শুটজের কাছে অর্থপ্রদান প্রক্রিয়া এই জগতের অস্তিত্ব বোঝার জন্য অত্যন্ত জরুরী। অর্থপ্রদান কিন্তু কোনভাবেই কোনো বস্তুকে বোঝায় না, তার কারণ হচ্ছে সব সময়ই অভিজ্ঞতা বস্তু, ওপর প্রদান করা হয়। অর্থাৎ ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর তার ওপর অর্থ প্রদান করা হয়।

সামাজিক জগতের অনুধাবনে অর্থপ্রদান যে গুরুত্বপূর্ণ এ কথা শুটজের আগে ম্যাক্স ওয়েবার বলেন। ওয়েবার মনে করতেন যে কোনো সামাজিক ক্রিয়া হয় অভ্যাসবশতঃ অথবা আবেগজনিত কারণে ঘটে। এই দু'ধরনের (ওয়েবারের চার ধরনের সামাজিক ক্রিয়ার মধ্যে) ক্রিয়ার ক্ষেত্রেই অর্থপ্রদান সবচেয়ে গুরুত্ব পায়। শুটজ ওয়েবারের এই অর্থপ্রদানের ধারণার সমালোচনা করেন। তিনি দেখান ওয়েবারের মতানুযায়ী কোনো ক্রিয়ার অর্থ তা ঘটার আগে নির্ধারিত হয়ে যায়। ওয়েবারের কাছে ক্রিয়া তখনই অর্থপূর্ণ যখন তা কতগুলি লক্ষ্যের দ্বারা নির্ধারিত থাকে। এবং এই ক্রিয়ার অনুপ্রেরণা ও লক্ষ্য স্থির করে তবেই ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। শুটজ অন্যদিকে দেখান, অর্থপ্রদান সব সময়ই ব্যক্তির সচেতনতার সঙ্গে সম্পর্কিত। আমরা যতক্ষণ কোনো বিষয়ে সচেতন না হই ততক্ষণ পর্য্যন্ত তার কোনো অর্থ আমাদের কাছে থাকে না। আবার যা কিছু আমাদের চারপাশে ঘটছে, যা কিছু আমাদের চেনা তা ছাড়া আর কোনো কিছুর সম্বন্ধেই আমাদের কোনো সচেতনতা থাকে না। অর্থাৎ ঘটনা ঘটার পরই আমরা যে সম্বন্ধে সচেতন হতে পারি। যখন আমরা ভবিষ্যতের কোনো ঘটনা সম্বন্ধে ভাবি বস্তুত আমরা তখন অতীতে সেটি কীভাবে ঘটেছে সে সম্বন্ধে ভেবে থাকি। অর্থাৎ শুটজের কাছে অর্থপ্রদান কখনো ঘটনা ঘটার আগে নির্ধারিত হতে পারে না।

কোনো ঘটনাকে ফিরে দেখার মাধ্যমে ঘটনাটি আমাদের কাছে অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে। আমাদের অভিজ্ঞতার ধারাবাহিকতায় কোনো একটিকে নির্বাচন করে আমরা সেই সম্বন্ধে কোনো বস্তুর অর্থদান করে থাকি। সুতরাং শুটজের কাছে অর্থপ্রদান একটি ব্যক্তিগত ও আত্মবাদী প্রক্রিয়া। এই ক্ষেত্রে শুটজের অর্থপ্রদান প্রক্রিয়া শুধুমাত্র ওয়েবার ন-ন মিডের (Mead) থেকেও আলাদা। মিড মনে করেন, সামাজিক মিথষ্ক্রিয়ার মধ্যেই অর্থ সৃষ্টি হয়। অর্থ, বচনের (Speech) তিনটি পর্যায়ের মধ্যে দিয়েই গড়ে ওঠে। যেমন সূত্র (Cue) সূত্র দেওয়া-র (Cue) প্রতি প্রতিক্রিয়া করা এবং প্রতিক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া করা।

শুটজ দেখান যে বাস্তব ও অর্থদান তখনই সম্পর্কযুক্ত হয় যখন মানুষের ক্রিয়ার অভিপ্রায় বা সাভিপ্রায়িতা (intentionality) এই দুই-এর মধ্যে মেলবন্ধন ঘটায়। অভিপ্রায় (intentionality) সব সময়ই কোনো না কোনো বস্তুর প্রতি লক্ষ্য করে গড়ে ওঠে। অর্থাৎ ঘটনা ঘটার পর তার অর্থদান করা বা ব্যাখ্যা করা হয়। যেমন ঘুম থেকে ওঠার পরই আমাদের ঘুম থেকে ওঠার অভিজ্ঞতা হয়। সে কারণে শুটজ বলেন এমন কোনো ঘটনা নেই, এমন কোনো ঘটনা নেই যার কোনো বিশেষ অর্থ আছে। অর্থাৎ আমরা যখন ভয় পাই তখন যেমন কোনো বিষয়ে ভয় পাই বা যখন আনন্দ হয় তখন কোনো ঘটনায় আনন্দিত হই। প্রতিটি ঘটনার স্মৃতিচারণের মাধ্যমে আমরা সেই ঘটনা বা বস্তুকে মনে রাখি ও ব্যাখ্যা করি। অভিপ্রায় (intentionality)-র মধ্যে শুটজের মতে মনোযোগ (attention) ও অভিপ্রায় (intention) দুই থাকে। বস্তু (object), ব্যবহার (behaviour), স্বত্বা (self) এই তিনের মধ্যে অভিপ্রায় (intentionality)-র মাধ্যমে এক অভূতপূর্ব 'ছাঁচ' (matrix) তৈরি হয়। যেমন ঘরের বাইরে ঝড় জল অনেকক্ষণ ধরে চললে আমাদের মাটির বাড়িটির প্রতি (বস্তু/object) ভয় হয় (আবেগ/emotion) কারণ বাড়ির ছাদের ওপর একটি গাছের ঝুলন্ত ডাল সমানে আছড়ে পড়ছে। এখানে ঝড় ও জল তখনই সত্য হচ্ছে যখন আমার কাছে পূর্ব অভিজ্ঞতায় ঝড় জলের মধ্যে গাছের ডালের মাটির বাড়ির ভারে আছড়ে পড়ার ঘটনা সম্বন্ধে জানা আছে।

সুতরাং ঝড় জলে আমি কি করব (intention) তা ঠিক হবে আমি এই তিনটির মধ্যে অর্থাৎ বস্তু, ব্যবহার ও সত্ত্বার মধ্যে কি সম্পর্ক ব্যাখ্যা করছি তার ওপর।

এই সূত্র ধরেই শুটজ প্রপঞ্চবাদের সঙ্গে সমাজতত্ত্বের এক গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলেন। অভিপ্রেত বস্তু (Intentional objects), বা যে বস্তু সম্বন্ধে আমরা অবগত এবং আমাদের কাছে যা অর্থপূর্ণ, তা বস্তুত সাংস্কৃতিক বস্তু। খাবার খাওয়ার পর রেস্তোরাঁয় বিল আদপে আমরা যেভাবে প্রতিক্রিয়া করি তা সাংস্কৃতিকভাবে অনুমোদিত, গঠিত এবং সম্বন্ধিত। যেমন 'গাড়ির ধাক্কায় পথচারীর মৃত্যু' ঘটনাটি আমাদের কাছে ভিন্নভাবে ব্যাখ্যায়িত হতে পারে তখনই যখন আমরা জানতে পারি গাড়ির চালক প্রকৃতিস্থ ছিলেন না, বা পথচারী ভুল দিক দিয়ে হাঁটছিলেন। অর্থাৎ ব্যাখ্যায়িত হওয়ার মধ্যে দিয়েই ঘটনাটি আমাদের কাছে অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে।

তবে শুটজ মনে করেন যে জগতের ব্যাখ্যার জন্য আমরা অভিপ্রায় (intentionality) প্রয়োগ করি তা আমাদের ব্যাখ্যা দানের আগেই ব্যাখ্যায়িত। আমাদের অভিজ্ঞতা হলো 'জ্ঞানের ভান্ডার' বা 'stock of knowledge'। এই 'জ্ঞানের ভাণ্ডার' এক ধরনের প্রাক্-অবহিতি বা 'taken for grantedness' সৃষ্টি করে যা বাস্তব ক্ষেত্রে সামাজিক অর্থদান প্রক্রিয়ার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে সাহায্য করে।

Unit 4 ❐ Contributions of Garfinkel

গঠন

4.1. গারফিঙ্কেল ও এথনোমেথোডোলজি (Garfinkel and Ethnomethodology)

4.2. গারফিঙ্কেলের এথনোমেথোডোলজি (Garfinkel's Ethnomethodology)

4.3. উপসংহার (Conclusion)

4.4. গ্রন্থপঞ্জি (Bibliography)

4.1. গারফিঙ্কেল ও এথনোমেথোডোলজি (Garfinkel and Ethnomethodology)

১৯৬৭ সালে হ্যারল্ড গারফিঙ্কেল তার বই 'স্টাডিজ ইন এথনোমেথোডোলজি' (Studies in Ethnomethodology) প্রকাশ করেন। এর পর থেকেই অনেক সমাজতাত্ত্বিক নিজেদের 'এথনোমেথোডোলজিস্ট' হিসাবে চিহ্নিত করতে শুরু করেন। ফলে, গারফিঙ্কেলের সঙ্গে এই তাত্ত্বিক দৃষ্টিভগির সূত্রপাত ঘটেছে এমনই বলা যেতে পারে। গারফিঙ্কেলের অনুসরণ অনেকে করলেও তিনি প্রধানত চারজনকে তার পূর্বসূরী হিসাবে চিহ্নিত করেন যারা ওঁর আগে দৈনন্দিন জীবন সম্বন্ধে চর্চা করেছেন বলে তিনি মনে করেন। এঁরা হলেন ট্যালকট্ পার্সন্স (Telcot-t Parsons), অ্যালফ্রেড শুটজ (Alfred Schutz), এরন গুরউইচ (Aron Gurwitsch), ও এডমন্ড হুসারেল (Edmond Husserl)। গারফিঙ্কেল এমন এক দৃষ্টিভঙ্গির জন্ম দিতে চেয়েছিলেন যা পার্সন্সের ক্রিয়াতত্ত্বের একটি দিককে আরো জোরের সঙ্গে উপস্থাপন করে। তিনি দেখান পার্সন্সের সামাজিক ক্রিয়ার তত্ত্বেই এথনোমেথোডলজি দৃষ্টিভঙ্গির প্রকৃত সূত্রপাত এবং ক্রিয়াবাদ ও এথনোমেথোজলজির জনক হিসাবে তিনি পার্সন্সকেই চিহ্নিত করেন। পার্সন্স দেখিয়েছিলেন যে মানব ব্যবহারের ভিত্তিই হলো অবস্থা/ভরসা (trust)। গারফিঙ্কেল অন্য দিকে যে কোনো ধরনের প্রাক্-অবহিতিকেই প্রশ্ন করেন সামাজিক মিথস্ক্রিয়ায় সামাজিক স্থিতাবস্থাকে কেন্দ্র করে গড়ে করে গড়ে ওঠা প্রাক-অবহিতি (taken for granted assumption)-কেই প্রশ্ন করেন।

১৯৪৫ সালে গারফিঙ্কেল কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে কৌতূহলী হয়ে ওঠেন যে সাধারণ মানুষ কিভাবে সামাজিক সংগঠন সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ করেন এবং কিছু প্রাক্-ধারণার গঠন করেন।

শুটজের সঙ্গে গারফিঙ্কেলের বক্তব্যের কিছু মিল ও অমিল রয়েছে। যেমন শুটজ আগুন্তকের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে গোষ্ঠীর সংগঠনকে প্রশ্ন করেন। তুলনায় গারফিঙ্কেল এই একই দৃষ্টিভগির ব্যবহার করতে চান কিন্তু আগন্তুকের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে নয়, বরং সাধারণ গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। এদের দু'জনের ক্ষেত্রে মিল এখানেই যে দু'জনেই দৈনন্দিন জীবনকে বুঝতে চেয়েছেন। শুটজ মনে করেন যে এই দৈনন্দিনকে বুঝতে হলে কোনো বিশেষ অনুপ্রেরণা দরকার। এবং সেটা সম্ভব তখনই যখন সমাজতাত্ত্বিক নিজেকে দৈনন্দিন জীবনের সমস্ত ব্যবহারের থেকে দূরত্বে নিয়ে গিয়ে দৈনন্দিন জীবনকে দেখতে উৎসাহী হবেন।

গারফিঙ্কেল দৈনন্দিনকে দেখার ক্ষেত্রে 'বিশেষ অনুপ্রেরণা' (Special Motive) হিসাবে কোনো দৈনন্দিন ঘটনার সংগঠিত ভাবকে অগোছালো বা অসংগঠিত করে দিয়ে সেই ঘটনাকে দেখতে চান। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই গারফিঙ্কেল তার শ্রেণিকক্ষে তার ছাত্রদের বাড়ি ফিরে আগুন্তুকের মত ব্যবহার করতে বলেন। সংগঠিত, গোছানো দৈনন্দিন হঠাৎ-ই এইভাবে অগোছালো ও অসংগঠিত হয়ে পড়ে। সুতরাং এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সমাজতত্ত্ব তখনোই সমাজে আত্মহত্যার হার বা ধর্মের প্রকৃতি জানতে উৎসাহী নয়। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে মূল উদ্দেশ্য হলো বিবরণ এবং সমাজতত্ত্বের বিষয়বস্তু হলো সাধারণ মানুষের পক্ষ থেকে সামাজিক বিশ্বের অর্থ অনুধাবন করা। অর্থাৎ সামাজিক ক্ষেত্রে মানুষ যে পদ্ধতি ব্যবহার করে, যে ব্যাখ্যার মাধ্যমে সামাজিক বিশ্ব সম্বন্ধ ধারণা ও জ্ঞন আহরণ করে সেই পদ্ধতির অবলমন্ন করে সামাজিক বিশ্বকে ব্যাখ্যা করাই এই সমাজতত্ত্বের উদ্দেশ্য।

4.2. গারফিঙ্কেলের এথনোমেথোডোলজি (Garfinkel's Ethnomethodology)

গারফিঙ্কেল তার গবেষণার মাধ্যমে তার সমাজতত্ত্বের কিছু বিশেষ চরিত্রের বর্ণনা করেন। এই বৈশিষ্ট্যের মধ্যে অন্যতম হলে গণনা (accounting)। 'গণনা' বলতে বোঝায় যে কোনো সামাজিক ঘটনাকে নিজের কাছে ও অপরের কাছে অর্থপূর্ণ করে তোলার সক্ষমতা। এর জন্য প্রয়োজন ভাষা ও অর্থদান প্রক্রিয়া। মানুষ তার ক্রিয়াকলাপ বোঝানোর জন্য বা বিশ্লেষণের জন্য সব সময়ই ভাষাগত বা মৌখিক গণনা (account) দেন। গারফিঙ্কেল সমাজতাত্ত্বিকদের প্রতিবর্তক (reflexive) ব্যবহার করার আহ্বান জানান। যেমন কোনো শিশুকে যদি তার আঁকা ছবির ব্যাখ্যা করতে বলা হয় তাহলে শিশুটিকে তার আঁকা ছবির একটি গণনা (account) দিতে বলা হবে। যদি তার শিক্ষক শিশুটির নিজের কাজের ব্যাখ্যায় উৎসাহিত হন তাহলে কখনোই শিশুকে তার ছবি সম্বন্ধে প্রশ্ন করে বিব্রত করবেন না। বরং তার ছাত্রদের শিল্পী সত্ত্বার বিকাশ ও উদ্ভাবন সম্পর্কে উৎসাহী হয়ে জানতে চাইবেন। এবং শিশুটি যে ব্যাখ্যা দেবে তার থেকেই তার ছবির অর্থ স্পষ্ট হবে।

যখন সাধারণ মানুষ তাদের ক্রিয়াকলাপের ব্যাখ্যা দেন তখন তারা বেশিরভাগ সময়ই সাংকেতিক ভাবে বা অল্প কথা ও ভাবভঙ্গির মাধ্যমে তা প্রকাশ করেন। যা থেকে কিছুটা ভাষার মাধ্যমে প্রকাশিত হলেও অনেকটাই বুঝে নিতে হয়। যা কিছু ভাষায় প্রকাশিত হয় না কিন্তু 'বুঝে নিতে হলো' বলতে গারফিঙ্কেল বলছেন 'সূচনীয় প্রকাশ' (indexical expression)। এই কারণে গারফিঙ্কেল ছাত্রদের সাধারণ মানুষের বক্তব্যকে লিখিত আকারে প্রকাশ করার সময় কাগজের বাঁ দিকে তারা সঠিক কি বলেছেন তা লিখতে বলতেন এবং কাগজের ডান দিকে তারা যাদের সঙ্গে কথা বলছেন তিনি ও তারা সেভাবে একে অপরের কথা বুঝে নিয়ে পরবর্তী বক্তব্যে এগোচ্ছেন তা লিখতে বলতেন। ফলে দেখা গেল যে কাগজের ডান দিকে লেখা বেশি হচ্ছে বাঁ দিকের তুলনায়। কিন্তু বাঁ দিকে যা লেখা হয়েছে তার সঙ্গে ডান দিকে লেখার সম্পর্ক আছে। গারফিঙ্কেল এইভাবে অর্থ বুঝে নিয়ে কথাবার্তা এগোনোকে বলেন 'ইত্যাদি'-র (etcetera principle) নীতি। গারফিঙ্কেল দেখিয়েছেন গণনা (accounts) ও অর্থদান দুই কোন পরিস্থিতিতে কথাবার্তা চলছে এবং তার প্রকৃতি কি তার ওপর নির্ভরশীল। গারফিঙ্কেল তার পরীক্ষা নিরীক্ষায় দেখাতে চেয়েছেন যে দু'জন মানুষের কথোপকথনে পরিস্থিতি বা এলাকা, সময়, কারা সেখানে উপস্থিত, ক্রীড়কদের (actor) উদ্দেশ্য

ও মনোভাব ও একে অপরের মনোভাব সম্পর্কে ধারণার ওপর নির্ভর করে। এই সব কিছুকে একত্রে গারফিঙ্কেল বলেন 'সূচনীয়তা' (indexicality)। গারফিঙ্কেল তার বক্তব্যের মাধ্যমে বোঝাতে চেয়েছেন বা সামাজিক মিথষ্ক্রিয়া পরিস্ফুট হয় একমাত্র কোনো প্রেক্ষিতেই। এবং এই প্রেক্ষিত সম্বন্ধে অবহিতি ও তাৎপর্যই এথনোমেথোডলজির মৌলিকতা।

গারফিঙ্কেল তার এথনোমেথোডলজিতে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদানের উল্লেখ করেন। তিনি তার ছাত্রদের উৎসাহিত করেন সাধারণ বিষয় সম্বন্ধে প্রশ্ন করে উত্তরদাতার প্রতিক্রিয়া নথিভুক্ত করতে। অর্থাৎ তিনি দেখাতে চান মানুষ যখন কথাবার্তা বলে তখন তারা ধরেই নেয় যে অপরপক্ষ সব কথা স্পষ্ট করে না বোঝালেও বুঝে নিচ্ছে। কিছু ক্ষেত্রে হঠাৎ করে প্রশ্ন করলে এর প্রতিক্রিয়া হয় তীব্র, ঝাঁঝালো আবার কখনো মানুষ অন্যরা তা শান্তভাবেই প্রতিক্রিয়া করে। গারফিঙ্কেল এই পরীক্ষার মাধ্যমে দেখতে চেয়েছিলেন মানুষ সামাজিক ক্রিয়া করতে গিয়ে কতটা সামাজিক ক্রিয়ার গণনা বা হিসাব (account) করতে পারেন। এর কারণ মানুষ কোনো ঘটনা বা পরিস্থিতির অর্থ বুঝতে ও বোঝাতে সামাজিক মিথষ্ক্রিয়ায় ভাষার ব্যবহার করে। যেমন গারফিঙ্কেলের পরবর্ত্তীতে প্যামেলা ফিশম্যান (১৯৭৮) তার গবেষণার এই পদ্ধতির ব্যবহার করে দেখিয়েছিলেন দম্পতির মধ্যে কথোপকথনে স্ত্রীর যে বক্তব্যের উত্থাপন করছেন তা নিয়ে কথা বেশি এগোচ্ছে না কিন্তু স্বামী যে বিষয় উত্থাপন করছেন তা নিয়ে বিস্তারিত কথোপকথন হচ্ছে। ফলে ফিশম্যান দেখান যে কথোপকথনে দম্পতি সামাজিকতার কাঠামোবদ্ধ নারী-পুরুষের মধ্যে ক্ষমতা সম্পর্ক মেনেই কথাবার্তা বলেন। এই পরীক্ষা থেকে বোঝা যায় শব্দের বা শব্দবন্ধের মাধ্যমেও গণনা (accounting) হয়ে থাকে। সুতরাং এথনোমেথোডলজিতে শব্দের প্রেক্ষিতে কোন্ শব্দ, উত্তরদাতা নিজে তার বক্তব্যকে কিভাবে ব্যাখ্যা করেন ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হিসাবে গণ্য হয়।

4.3. উপসংহার (Conclusion)

সামাজিক মিথষ্ক্রিয়াবাদী ভাবনার প্রপঞ্চবাদী ও এথনোমেথোডলজি দৃষ্টিভঙ্গির চিন্তাধারায় কয়েকটি বিশেষ উপস্থাপন তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। যেমন, যে কোনো মিথষ্ক্রিয়ারত অবস্থায় মানুষ সেই পরিস্থিতির উপযুক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি সম্বন্ধে ঐক্যমতে পৌঁছয়। দ্বিতীয়, এই বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যবহার, মতামত, বিশ্বত্রাস যে কোনো ভাবনাই হতে পারে। তৃতীয়ত, এই ঐক্যমত্য প্রকাশের জন্য মানুষ স্পষ্ট বা লুক্কায়িতভাবে আন্তঃব্যক্তিগত পর্য্যায়ে কিছু পদ্ধতি গড়ে তোলে। চতুর্থতে, এই আন্তঃব্যক্তিগত ব্যাবহার ও পদ্ধতি সমূহই মিথষ্ক্রিয়ারত ব্যক্তিদের 'প্রত্যক্ষকরণ' (perception) হিসাবে ঘণ্য হয়। পঞ্চত, মিথষ্ক্রিয়ারতকালে দুই বা তার বেশি ব্যক্তি কথোপকথন ও মিথষ্ক্রিয়ার অন্তর্নিহিত নিয়মগুলিকে মান্যতা দেন। ষষ্ঠত, একটি মিথষ্ক্রিয়ারত পরিস্থিতির নিয়ম সেই পরিস্থিতি সাপেক্ষ বিশেষ। কোনোভাবেই এই নিয়মের সম্বন্ধে কোনো সাধারণীকরণে পৌঁছানো সম্ভব নয়। সপ্তমত, সুতরাং একটি পরিস্থিতির নিয়মের গঠন, পুনঃগঠন, বা পরিবর্তনের মাধ্যমে সদস্যরা একে অপরকে ঐ পরিস্থিতির স্থিতি ও স্থায়েত্বির প্রত্যক্ষকরণ (perception) ও দেন। এইভাবে পরিস্থিতি নির্ভর সামাজিক স্থিতি ও স্থায়িত্বের ধারণাও গড়ে ওঠে।

4.4. গ্রন্থপঞ্জি (Bibliography)

MODEL QUESTIONS

নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির যথাযথ উত্তর দিন।

১। নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর লিখুন। ৬

(ক) প্রপঞ্চবাদী সমাজতত্ত্বে এডমন্ড হুসারেলের 'ব্র্যাকেটিং' (Bracketing) সম্বন্ধে কি বলতে চেয়েছেন?

(খ) এথনোমেথোডলজি দৃষ্টিভঙ্গির তিনটি মৌলিক ভাবনার উল্লেখ করুন।

(গ) অ্যালফ্রেড শুটজ প্রাক্ অবহিতি (taken for granted) সম্বন্ধে কি বোঝাতে চেয়েছেন তা লিখুন।

(ঘ) হ্যারল্ড গারফিঙ্কেলের উত্তরসূরী কোনো একটি ধারার উল্লেখ করুন।

২। নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির বিস্তারিত উত্তর লিখুন। ১২

(ক) প্রপঞ্চবাদী ভাবনার মৌলিকতা সম্বন্ধে লিখুন।

(খ) এথনোমেথোডলজি দৃষ্টিভঙ্গির মূলধারার সমাজতত্ত্বের সমালোচনা সম্বন্ধে লিখুন।

(গ) স্বাভাবিক আচরণ কাকে বলে? শুটজ কিভাবে এই ধারণাটির ব্যাখ্যা করেছেন?

(ঘ) গারফিঙ্কেল প্রদত্ত সূচীয়তা (indexicality) ধারণাটির সম্বন্ধে লিখুন।

৩। নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির ওপর প্রবন্ধ রচনা করুন। ২০

(ক) প্রপঞ্চবাদী সমাজতত্ত্বের ওপর একটি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ রচনা করেন।

(খ) এথনোমেথোডলজি দৃষ্টিভঙ্গির মৌলিকতা কোথায়? এই দৃষ্টিভগি মূলধারার সমাজতত্ত্বকে কিভাবে সমালোচনার মাধ্যমে তার নিজের মৌলিকতা স্থাপন করেছে সে বিষয়ে একটি প্রবন্ধ রচনা করেন।

(গ) 'সূচনীয়তা' (indexicality) কি? গারফিঙ্কেলের সঙ্গে এই ধারণাটি কিভাবে এসেছে এবং কতটা গুরুত্বপূর্ণ?

(ঘ) শুটজের অবদান সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ রচনা করুন।

....